প্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা : উনিশ শতকের কলকাতা ও বটতলা

সুদেব বোস

Abstract

Kolkata, previously called Calcutta grew as a big city and the capital of the British Empire since 1773. The East India Company treated the city next to London and decorated it superbly in the early 19th century. British officials had many scopes of enjoyment like the theatre, ball dances, etc. but they left a huge number of native people in poverty and misery. The natives lived in a very unhygienic environment and were deprived from education. It was the time when books began to be published in the Bengali language, but books were still expensive. The poorer section of people found a space for literature and entertainment in the 'Bottola' culture. A press under a big banyan tree in Sovabajar began publishing books at a very low cost. In the next few decades almost thousand presses were established. The paper quality was very sub-standard and they appointed some canvassers in the remote villages. The books content of these books were gossip, sexual narratives and scandals and similar subjects of low culture. However, scholars of literature and sociology acknowledge that they contributed to vernacular education for women and the poor. Books were on nijamat laws, quack treatment, family matters, etc. by the 'bottola' presses.

In this essay I tried to explore economic and sociological aspects of 'bottola' publication. I consider the fact that in the nineteenth-century readers in Kolkata belonged to different tastes, demands and intellectual capabilities. Bengali publication was divided broadly for people of two different classes: the rich and the poor. 'Bottola' presses served the poorer section of society. These publishers could access the most interior villages as a wandering market of books. Thus 'bottola' surely claims the honour of being an institution of public literature.

Keywords: *Bottola, popular culture, the poor in Calcutta, socio-economic aspect, rural education.*

।১।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দেড়শো বছরেরও বেশি সময় কলকাতা কার্যত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান নগরী ছিল, তাই এ শহরের ইতিহাসে বৈচিত্রময়তার কোনো অভাব নেই। এবং সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই কলিকাতা নামক একটি গ্রাম নতুন জাতি, নতুন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে নিজের রূপ বদলাতে শুরু করে। সেই চলমান

পরিবর্তনের সূত্র ধরে বদলাতে থাকে মানুষের জীবন। অবশ্যই এই পরিবর্তনের অংশীদার ছিল সাহিত্য–সংস্কৃতিও, কারণ আঞ্চলিক ইতিহাসের সংজ্ঞা হিসেবে Oxford English Dictionary আমাদের জানাচ্ছে, 'The branch of history that deals with the social, economic and cultural devolopment of particular localities, oten uses local records and particulars.' (Second Edition, 1989) উনিশ শতকের কলকাতায় এমন অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। সেখান থেকে আমরা বেছে নেব বটতলা নামক একটি বিশেষপ্রকাশনার ধারাকে যাকে বলা যেতে পারে উনিশ শতকের জনসাধারণের সাহিত্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই বটতলা কিন্তু শুধুই কিছু বিশেষ ধরণের বই ও তার পাঠককুল অথবা তাকে ঘিরে বিতর্ক বা বিদ্রুপের খতিয়ান নয় বরং একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে নির্দেশ করে। আমরা জানি যে, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনচর্যা ও সমাজের গঠনের সঙ্গে সাহিত্যের এক গভীর আন্তঃসম্পর্ক বিরাজ করে। তাই উনিশ শতকের প্রেক্ষাপট অবলোকন করে আমরা দেখতে চাইব বটতলার মত একটি অঞ্চল ও তার জনগোষ্ঠীর মানসিক গঠনকে কেন্দ্র করে, একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে কীভাবে এই সময়কালে একটি সমান্তরাল জনপ্রিয় সংস্কৃতির চর্চা চলেছিল, যা অন্য কোনো দেশ বা রাজ্যে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক কারণেই সম্ভব ছিল না।

।২।

১৮৪৫ সালের কলকাতা শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি বসেছিল। তাঁদের রিপোর্টে স্পষ্ট ভাষায় লেখা হল '...rankest compound of villaious that ever offend nostrill ' (মূলানুগ), সোজা কথায় নাকে রুমাল গুঁজে পথ চলতে হয়েছে তাদের।[১]

এ ঘটনার আগে থেকেই কিন্তু কলকাতাকে সাজানো শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম, বেলভেডিয়ার হাউস, রাইটার্স বিল্ডিং–এর মত প্রাসাদোপম অট্টালিকা তো বটেই এমনকি হিন্দু কলেজ, হেয়ার স্কুল, মেডিকাল কলেজের মত প্রতিষ্ঠানও দিনের আলো দেখেছে ততদিনে, তবুও কলকাতার এই অপরিচ্ছন্ন, বেআব্রু চেহারা চোখে পড়েছিল সাহেবদের, কারণ তাঁরা হেঁটেছিলেন ব্ল্যাক টাউনের রাস্তায়। সেদিনের কলকাতা ছিল বর্ণবিদ্বেষী বিভাজনে হোয়াইট টাউন আর ব্ল্যাক টাউনে বিভাজিত। ট্যাঙ্ক স্কোয়ার, চৌরঙ্গি, আলিপুর এর মত বিলাসবহুল জায়গা, যা কঠোরভাবে সংরক্ষিত ছিল ইউরোপীয় শাসকদের জন্য পড়েছিল হোয়াইট টাউনের মধ্যে। অন্যদিকে চিৎপুর, গরানহাটা, পটলডাঙার মত জায়গায় বাস করত নেটিভরা। যদিও সেখানেও বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত বাবু বিশাল অট্টালিকায় বাস করতেন, যাঁদের মধ্যে কারো মাতৃশ্রাদ্ধের খরচ ছিল

নয় লক্ষ টাকা, কেউ বেড়ালের বিয়ে দিতেন, কেউ এলাহি আয়োজনের পার্টিতে সাহেবদের মদ্যপান করিয়ে খ্যাতি কুড়োতেন। তবে শহরের বাকি অংশ ছিল প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মত, প্রকৃত অর্থে 'ব্ল্যাক'। সেখানে ছিল গাদাগাদি করা খোলার ঘর, পায়ে চলার রাস্তা প্রায় ছিল না, মানুষ আর পশুর মৃতদেহ সৎকারের জন্য নির্ভর করতে হত শেয়াল–শকুনদের উপর। ম্যালেরিয়া, কলেরার মত রোগ ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। এত অপরিষ্কার জায়গা গোটা বিশ্বে নেই, অসভ্য আদিম আমেরিকান চাষারাও তুলনায় স্বাস্থ্যসচেতন– ব্ল্যাক টাউন সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য করেছেন সাংবাদিক হিকি থেকে রুডিয়ার্ড কিপলিং। কিন্তু কারা ছিল এখানের বাসিন্দা?

কলকাতার জনসংখ্যার সিংহভাগেরই বাসভূমি ছিল এই ব্ল্যাক টাউন। আর্থিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও মুনশী নবকৃষ্ণ দেব বা গোবিন্দলাল মিত্রের ভদ্রাসনগুলো ছিল এখানেই। বাবু নামে সম্মানিত হলেও হোয়াইট টাউনে প্রবেশাধিকার পাননি তাঁরা। এছাড়া ছিল হঠাৎ বড়লোকের দল, সওদাগর, বেনিয়ান, কেরাণী, ডাক্তার , চিকিৎসক, মুনশী, দোভাষীর দল এবং সমাজের একেবারে নিচের স্তরে বাস করা অসংখ্য হতদরিদ্র মানুষ। যাদের একটা বিরাট অংশ গ্রামীণ সমাজ ছেড়ে দুমুঠো খাবারের খোঁজে পাড়ি জমিয়েছিল কলকাতায়। মনে রাখতে হবে এদের মধ্যে যেমন নিঃস্ব কৃষকরা ছিল তেমনি ছিল অবশিল্পায়নের ফলে কাজ হারানো অসংখ্য গ্রাম্য কারিগর। কলকাতার নির্মীয়মাণ কলকারখানার শ্রমিকরাও ছিল এর মধ্যে। শ্রীপান্থ জানাচ্ছেন এদের রোজগার ছিল এক বা দেড় পেন্স যাতে দৈনিক পেট ভরানো ছিল কার্যত অসম্ভব। তবুও এই সমাজে অস্তিত্ব ছিল জুয়ার। আর এই বিভিন্ন রোজগারের দেশি মানুষদের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল মূলত দুটি। তার একটি সোনাগাছির বেশ্যাপল্লী হলে অন্যটি অবশ্যই শোভাবাজারের বটতলা।

সোনাগাছি আর বটতলাকে যমজ বলেই চিহ্নিত করেছেন প্রাবন্ধিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে,

> উভয়ের খদ্দেরদের ব্যাপক অংশ একই দলভুক্ত – কলকাতার খেটে খাওয়া, দিনান্তে ক্লান্ত–বিপর্যস্ত, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, স্বল্পশিক্ষিত চাকুরিজীবী, ফোড়ে–দালাল, পরাশ্রয়ী সুযোগসন্ধানী, হঠাৎবাবু ও তার মোসাহেব। এক দঙ্গল সোনাগাজিতে যেত ফূর্তির সন্ধানে, দৈহিক উত্তেজনার খোঁজে। আর এক দঙ্গল মানসিক আমোদ পেত বটতলার রোমাঞ্চকর কাব্য–উপাখ্যান–প্রহসনের দৈনন্দিন পসরায়।[২]

বটতলার পাঠক হিসেবে যে সমাজটাকে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে বইপড়া, অথবা শোনা

একেবারে দুর্লভ ছিল না। গ্রাম্য সমাজ থেকে আসা মানুষদের একটা অংশ পাঠশালায় প্রথম পাঠটুকু নিয়ে এসেছিল। অন্যদিকে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজ সহজেই আকৃষ্ট হল বটতলার নিষিদ্ধ প্রেমোপাখ্যান বা অশ্লীলতার গন্ধ মাখা রচনার প্রতি। এই পরিস্থিতিতেই শোভাবাজারের পশ্চিমে বটগাছের তলা থেকে ক্রমশ বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বটতলা। শিয়ালদা, চাঁপাতলা, বৌবাজার, দর্জিপাড়া, গরানহাটা, সিমলে, জোড়াসাঁকো, আহিরিটোলা, কলুটোলার বুকে বটতলার ছাপাখানাগুলো আত্মপ্রকাশ করে। মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাবের পর সুলভ ছাপার ব্যবস্থা, সহজ বাংলা ভাষা, এবং টার্গেট রিডার এই তিনে মিলে কলকাতার বুকে এক সমান্তরাল সংস্কৃতির পথচলা শুরু হল। উইলিয়ম জোনসের এশিয়াটিক সোসাইটি যখন ভারতবিদ্যাচর্চা অব্যাহত রাখছে, ফোর্ট উইলিয়মে বাংলা গদ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হচ্ছে, মধুসূদন গুপ্ত শল্যচিকিৎসার পথ খুলে দিচ্ছেন, হিন্দু কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের কিংবদন্তী পাঠদান করছেন ডি.এল.রিচার্ডসন কিন্তু সেই উন্মাদনার শরিক তো ছিল অভিজাত উচ্চশিক্ষিত বাঙালি, আজকের ভাষায় 'creamy layer' –এর দল। বটতলার লক্ষ্য তো তাঁরা নন, বরং তার উদ্দেশ্য ছিল সারাদিনের উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর যারা সস্তার মদের সঙ্গে চটুল কাহিনির তৃপ্তি খোঁজে, তাদের কাছে পৌঁছানো। 'রতিবিলাস রসমঞ্জরী', 'বেশ্যারহস্য', 'হুড়কো বৌ এর বিষম জ্বালা' (১৮৬৩) বা গুপ্তকথা সিরিজের 'সরসীলতার গুপ্তকথা'(১৮৮৩), 'ফচকে ছুঁড়ির গুপ্তকথা'(১৮৮৬), ইত্যাদি রকমারি বইয়ের তুমুল জনপ্রিয়তা তৈরি হতে সময় লাগেনি। এই জনপ্রিয় গ্রন্থরাজির মধ্যে অন্যতম ছিল প্রহসন। কলকাতা তথা বাংলার সমাজের যেকোনো বিসদৃশ ঘটনা বটতলার প্রহসনের বিষয় হয়েছে, যেমন কন্যাপণ নিয়ে 'কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে' (১৮৬৩), 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' বা প্রিন্স অব ওয়েলসকে নিয়ে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' (১৮৭৬)। তারকেশ্বরের মোহন্ত–এলোকেশীর ঘটনার পর প্রহসনকারদের নিঃশ্বাস ফেলার অবসর ছিলনা। শ্রীপান্থ তাঁর বহুপঠিত গ্রন্থ 'মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ'–এ এই বিষয়ক প্রহসনের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন।[৩] একইভাবে বিধবা সম্ভোগ, ধর্মের নামে ধর্ষণ, যৌন দুরাচার সবই প্রহসনের রসদ জুগিয়েছে যার অন্যতম উদাহরণ হল ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে নিমাইচাঁদ শীলের 'এরাই আবার বড়লোক' নামের ব্যঙ্গাত্মক রচনাটি। অতএব দেখা যাচ্ছে একদিকে জনমানসে বিপুল চাহিদা অন্যদিকে তথাকথিত সুসভ্য সমাজের ভণ্ডামি আর অন্যায় কলকাতার এই দুই প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে সমৃদ্ধ ক্রমশ হচ্ছিল বটতলা।

।৩।

বটতলাকে শুধুই কেচ্ছাকাহিনি আর নকশা প্রহসনের উৎস হিসেবে ভাবলে একান্তই

খণ্ডিত বিচার হবে। এই বইগুলো অবশ্যই বটতলার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, কিন্তু তার একমাত্র পরিচয় নয়। সপ্তদশ শতকের লন্ডনে শহরের প্রশাসনিক সীমানার বাইরে গ্রাব স্ট্রিটে একধরণের সস্তা জনপ্রিয় সাহিত্যের বাজার গড়ে উঠেছিল, যেখানে নানা ধরণের ব্যালাড, কাব্যকাহিনি, জেস্টবুক বা ছোট হাসির গল্প, চ্যাপ বুক বা নানা রকম রসালো কাহিনি পাওয়া যেত, যা কালক্রমে উনিশ শতকের লন্ডনের জনপ্রিয় সাহিত্যের তীর্থভূমি হয়ে ওঠে। আপাতভাবে দুটি জায়গার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও গ্রাব স্ট্রিটের সঙ্গে বটতলার তুলনা করলে তা অতি সরলীকরণ হবে। উনিশ শতকের কলকাতার বটতলা সমাজ–সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানে সমাজের বিভিন্ন দিক এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে এই বটতলা অচিরেই কলকাতা বা বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এর প্রধান কারণ ছিল বটতলার বিষয়বৈচিত্র্য। সমাজের অদ্ভুত বা বিসদৃশ সমস্ত ব্যাপারই ধরা পড়েছে বটতলার প্রহসনের আয়নায়। জয়ন্ত গোস্বামীর তৈরি সাড়ে চারশো প্রহসনের তালিকাই তার প্রমাণ দেয়।[৩] আর বিষয়গত বৈচিত্র্যের কথা বললে সবচেয়ে আগে আসবে ধর্মপুস্তক। বটতলার প্রকাশনার শুরু ১৮১৭তে, আর এর স্বর্ণযুগ ১৮৪০–১৮৬৫, যদিও এরপরেও সুদীর্ঘসময় বটতলার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের উপলব্ধির বহু আগেই বটতলার প্রকাশকরা বুঝে ফেলেছিলেন 'মর্মাশ্রয় করিতে গেলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে'। রামায়ণ, মহাভারত এবং বিবিধ ধর্মপুস্তক পড়তে সমাজের কোনো স্তরের বাঙালিরই কখনো অরুচি ছিল না। ১৮৫৫ সালে জেমস লং একটা তালিকা বানান প্রায় চোদ্দশো বাংলা বইয়ের, সেখানে ধর্মপুস্তকের মধ্যে ছিল কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরামের কাব্য, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, নরোত্তমবিলাস, গীতচিন্তামণির মত বইপত্র। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ

> আজ একথা ভুলিলে চলিবে না এই (বটতলার) ছাপা পড়িয়াই আমাদের প্রপিতামহী–পিতামহীরা ইস্কুল কলেজের ধার না ধারিয়াই তাঁহাদের ইংরেজি পড়া পতিদেবতাদের তুলনায় বেশি সত্য করিয়াই শিক্ষিত হইয়াছিলেন.....অথচ সেসময় দেশের গণ্যমান্যরা,ইংরেজি শিক্ষাভিমানীরা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা সাহিত্যের কোন ধারই ধারিতেন না।[৪]

অতএব গল্পটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় অভিজাত আর অনভিজাতের লড়াই। দেশীয় ভাষা আর ইউরোপীয় উন্নাসিকতার লড়াই। মেকলে প্রভাবিত নব্য ইংরেজিনবিশ সাহেবভজা বাঙালি আর সাধারণের রুচির সংঘাত। কলকাতায় কাজের খোঁজে আসা অসহায় অগণিতের বাংলা রেনেসাঁর প্রতি সবিশেষ উৎসাহ ছিল না। তাই তাদের এবং মধ্যবিত্ত

সমাজের একটা বড় অংশের কাছে বটতলার জনপ্রিয় আখ্যান–প্রহসন ছিল চরম সুস্বাদু। আর বটতলারপ্রকাশনাও চলত তাদেরই দাবি মেনে। লায়লা মজনু, বিদ্যাসুন্দর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, গোলেবকাওলি, অজস্র রকমারি পঞ্জিকা সবই বেরিয়েছে এখান থেকে। উকিলদের ব্যবসার জন্য যেমন সদর, নিজামত, দেওয়ানি আদালত, জমি সংক্রান্ত আইনের বই বেরিয়েছে তেমনি বেরিয়েছে 'ঔষধ ব্যবহারক', 'জলচিকিৎসা' বা 'চিকিৎসার্ণব'। বাংলার বুকে যতরকমের রোগ আছে তারপ্রায় সবকটির আয়ুর্বেদিক বা হাতুড়ে চিকিৎসার উপায় বাতলানো ছিল এই বইগুলিতে। বলাবাহুল্য অসংখ্য চিকিৎসক এবং রোগীর কাছে এই সহজ বইগুলি অপরিহার্য ছিল, কারণ সেসময় মেডিকেল কলেজের পরিষেবা সবার জন্য ছিলনা। আবার অ্যালোপ্যাথি–উৎসাহীদের জন্য কলম ধরেছিলেন শব–ব্যবচ্ছেদকারী মধুসূদন গুপ্ত, তাঁর লেখা তিনটে বই–ই বেরিয়েছিল বটতলার ছাপাখানা থেকে। একদিকে বাঙালিসুলভ ঐতিহ্য অন্যদিকে সমকালের দাবি এই দুয়ের মেলবন্ধন ঘটাল বটতলা। অনুকূল পরিবেশের প্রশ্নে তাই বলাই যায় পাঠক আনুকূল্যই ছিল বটতলার সবচেয়ে বড় পাওনা।

।৪।

কিন্তু কোথা থেকে আসত পাঠক আনুকূল্য? বই কিনে পড়ার সামর্থ্য কী আদৌ ছিল বটতলার পাঠকদের? বটতলার পাঠক বলতে তো ছিল গরীব জনসাধারণ থেকে মধ্যবিত্ত এমনকী উচ্চমধ্যবিত্তরা। যদি ধরেও নেওয়া হয়, সওদাগরি কাজ, মুনশী, ব্যবসাদারদের যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল, মধ্যবিত্ত শ্রেণি কী ছাপাখানার প্রথম যুগে বই কিনে বই পড়ার সামর্থ্য রাখত? উনিশ শতকে চাকুরিজীবী বাঙালির রোজগার কেমন ছিল একটু দেখা যাক।

১৮৫৬ সালের আগে কলকাতার সরকারী আপিসের কর্মীদের বেতনের তালিকা তৈরি করেছেনপ্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ। সেক্রেটারিয়েট বিভাগের বিভিন্ন অফিস, পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বিভাগ, আলিপুর কোর্ট, রেভিনিউ বোর্ড, স্ট্যাম্প ও স্টেশনারী বিভাগ, অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল এর অফিস, জেনারেল ট্রেজারি, কালেক্টরেট ইত্যাদি অফিসে প্রায় হাজারখানেক কর্মী ছিল কর্মরত। উচ্চবেতনের কর্মীদের মধ্যে ছিলেন–

বিদ্যাসাগর– ২০০টাকা, শম্ভুনাথ পণ্ডিত– ১৫০টাকা, রমাপ্রসাদ রায়–৩০০ টাকা, রাধানাথ শিকদার ৪০০টাকা

এছাড়া বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সেক্রেটারির অফিসে কয়েকজন অ্যাসিস্টান্ট, মুনশী, মুহুরি, সেরেস্তাদার, ট্রান্সলেটার, অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিস, কাস্টমস, অ্যাকচুয়ারি, পোস্ট অফিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে চাকুরিরত বেশ কিছু মানুষ ছিলেন, যাঁদের বেতন ছিল ১০০–৩৫০ টাকা। এই তথ্য দিয়ে বিনয় ঘোষ জানাচ্ছেন সরকারী চাকুরের নিম্নস্তরে

বাঙালি হিন্দুদের আধিপত্য ছিল, যাদের বেতন ছিল ১০–৬০ টাকার মধ্যে। তাঁর আরো মন্তব্য 'মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুর(নাগরিক) কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে প্রধানত এই নিম্নস্তরর চাকরি সম্বল করে.....বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আর্থিক সমস্যা ও সংকটের মূল কারণও এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সন্ধান করতে হয়'।[৫]

বাঙালি সমাজের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এই প্রসঙ্গটিকে সামনে রাখলে বটতলার উত্থানের কারণ স্পষ্ট হবে। এই মানুষগুলি তো বটেই এমনকি গ্রাম থেকে আসা জনসংখ্যার একটা অংশেরও ভালো রকম অক্ষরজ্ঞান ছিল। বই পড়া এমনকি পুঁথি নকলের কাজও অনেকে করত। বিংশ শতকের গোড়ায় দীনেশচন্দ্র সেন যখন বাংলার গ্রামে–গঞ্জে পুঁথি সংগ্রহ করছেন, তখন তিনি শতাধিক বছর আগে লেখা কিছু পুঁথি যেমন 'হরিবংশ', 'নৈষধ' ইত্যাদিও খুঁজে পান এবং প্রসঙ্গক্রমে জানতে পারেন মুক্তাক্ষরে লেখা ঐ লিপিগুলির লিপিকর এক ধোপার পূর্বপুরুষ। এ থেকে স্পষ্ট হয় আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের প্রথমেও বেশ কিছু গ্রামে পাঠশালা আর মক্তব ছিল যেখানে দুই সম্প্রদায়ই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠটুকু পেত। তাদেরই বিরাট অংশ যখন কলকাতায় পা বাড়াল তখনো পাঠের অভ্যেসটুকু একেবারে মরে যায়নি। নিরক্ষরদের ভরসা ছিল শোনা, একজনের পাঠ অন্যরা গোল হয়ে বসে শুনত। ভাবতে অবাক লাগলেও শহর কলকাতায় যেখানে অভাব, সমস্যা, লোক ঠকানো, মিছে কথার ছড়াছড়ি ছিল, সেখানেও এই চণ্ডীমণ্ডপ কালচার ছিল। গ্রাম্য লোকসংস্কৃতির বিষয়ের ওপর শহুরে প্রলেপ লাগিয়ে বটতলার যে বইগুলো বেরোতো তাদের পথপুস্তিকা নামে চিহ্নিত করেছেন শ্রীপান্থ। তাঁর কথায় 'শহরের বস্তি, কিংবা দরিদ্র কারিগর, শিল্পী, দোকানি কিংবা সাধারণ গৃহস্থঘর যেন এক একটি স্বপ্নের চণ্ডীমণ্ডপ'।[৬]

কিন্তু সদ্যোজাত ছাপাখানা কী তাদের স্বপ্নের পসরার জোগান দিতে পারত? সাধারণ মানুষের ঐ রোজগারের পাশে সেকালের নামী কিছু প্রকাশনার বই এর দামগুলো রাখা যাক–

বাংলা হরফে কালিদাসের ঋতুসংহার(১৭৭২)– দশ টাকা
গিলক্রিস্টের অভিধান ও ব্যাকরণ(১৭৯৬)– চল্লিশ টাকা
হটনের বাংলা–ইংরেজি অভিধান(১৮৩৩)– আশি টাকা
ফোর্ট উইলিয়ম থেকে বেরনো বত্রিশ সিংহাসন, লিপিমালা, কেরীর বাংলা ব্যাকরণ ও অন্যান্য গদ্যগ্রন্থ – চার থেকে আট টাকা
শ্রীরামপুর মিশনের ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণ– চব্বিশ টাকা

রক্ষণশীল সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসের ছাপা বেতাল পঞ্চবিংশতি– দুই টাকা।

এই দাম সত্ত্বেও গিলখ্রিস্টের অভিধানের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল বইটি অনেক কম মূল্যে দেওয়া হচ্ছে, যা থেকে সহজেই অনুমেয় এই বইগুলির পাঠক কারা ছিলেন। বটতলার প্রকাশকরা হাতে পেয়েছিলেন মুদ্রণযন্ত্র, হুগলির দুটি কাগজকলের সুলভ কাগজ এবং বিশাল পাঠককুল। তাই তাঁদের প্রকাশনা থেকে ছাপা বইগুলোর দাম মূল্যসূচকে এতটাই নেমে এল যে ঐ শ্রেণির পাঠককুল ঝাঁপিয়ে পড়ল–

৯৯পাতার লায়লা মজনু– ছ আনা
৪০ পাতার অন্নদামঙ্গল– দু পয়সা
৪৮ পাতার দাশরথি রায়ের পাঁচালি– এক আনা
৩৮ পাতার রসমঞ্জরী– দু আনা
১৯২ পাতার বিদ্যাসুন্দর– এক টাকা
১২৪ পাতার বত্রিশ সিংহাসন– ছ আনা
সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ(অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রেস)– দেড় টাকা
মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল(কমলালয় প্রেস)– এক টাকা

আচার্য সুকুমার সেন তাঁর 'বটতলার ছাপা ও ছবি' গ্রন্থে বইয়ের দামের তারতম্যের এই ছবিটি তুলে ধরেছেন। আর যে বইগুলো তথাকথিত অশ্লীল বিষয় নিয়ে লেখা, যেগুলোর তীব্র নিন্দা করেছেন জেমস লং থেকে কেশবচন্দ্র সেন, সেগুলোই ছিল এই মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও হতদরিদ্র মানুষদের লাইফলাইন। বিশেষত জলের দরে রামায়ণ–মহাভারত পেয়ে আত্মহারা সেদিনের বাঙালি। বইয়ের বিষয় নির্বাচনে বটতলা যেমন সামাজিক স্তর এবং রুচিকে ঠিকভাবে পড়তে পেরেছিল, তেমনি নির্দিষ্ট ইনকাম গ্রুপকেও তারা সঠিকভাবে বেছেছিল টার্গেট রিডার হিসেবে। আঞ্চলিক ইতিহাস তো মূলত একটি ভূখণ্ডের মানবজীবনচর্যার ইতিহাস। বটতলা সেই জীবনচর্যারই অকৃত্রিম ফসল।

শুধু এগুলোই নয়, আজকের বাণিজ্যিক ভাষায় আরেকটা অসামান্য ইউ.এস.পি ছিল বটতলার। সেখানের বইগুলোয় প্রকাশনাযন্ত্রের নাম থাকত, আর লেখা থাকত যাঁর প্রয়োজন এই দোকানে এই ঠিকানায় তত্ত্ব করবেন। কিছুদিন পর পাঠককে আসার কষ্টটুকু না দিয়ে তাঁরাই বেরিয়ে পড়লেন ফেরিওয়ালা হয়ে। শহর ছাড়িয়ে গ্রামে–গঞ্জে গিয়ে তাঁরা রকমারি পসরা বিলি করতে লাগলেন। সেইপ্রথম গ্রামের মানুষ একটা সাক্ষাৎ মানুষকে দেখল যে হাতে করে বই নিয়ে দেখাবে। ধর্মপুস্তক, প্রহসন, অশ্লীল রচনা, সংসারের টুকিটাকি, টোটকা চিকিৎসা, স্বামীকে বশ করা, ইসলামী রোম্যান্টিক আখ্যান বাড়ির

দরজায় এলো নামমাত্র দামে। এ যেন আজকের অনলাইন বুক ডেলিভারি। বইকে তাঁরা পণ্য করলেন ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রাম্য সাধারণের কাছেও বইপড়া অনেক বেশি করে ছড়িয়ে গেল। বটতলা তাই আঞ্চলিকতার ফসল হয়েও সেই গণ্ডী ভাঙতে শুরু করল।

।৫।

বটতলা গড়ে ওঠাকে সম্প্রদায়ের দিক থেকে বিচার করলেও আমরা একটি নতুন ভাবনার প্রেক্ষিত পেতে পারি। আগেই বলা হয়েছে আচার্য সুকুমার সেনের মতে বটতলার স্বর্ণযুগ ১৮৪০–১৮৬৫ সাল। তখন নবাবী আমলের শেষতম অবলেপটুকু মিলিয়ে গিয়েছে বাংলার ভাগ্যাকাশ থেকে, শহরের প্রধান অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে উঠছে ইংরেজি। কিন্তু তা বলে কী ছশো বছরের অভ্যস্ত আরবি ফারসি জনমানস থেকে মুছে গিয়েছিল? তখনো দেশের আইন আদালতের কাগজপত্র দেখলে নবাবী ভাষার অস্তিত্ব জানান পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যেও তা প্রকটভাবে ছিল এমনটা ভেবে নেওয়াই সঙ্গত। মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনকে অপবিত্র ও পাপাচারী ভেবে দূরে সরিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত ছিল, কিছুটা সেজন্যই সরকারি চাকরি ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে হিন্দু বাঙালির আধিপত্য এত বেশি ছিল। কলকাতার দরিদ্র পল্লীগুলিতে এবং বাংলার অগণিত গ্রামে যেসব মুসলিম সম্প্রদায় বাস করত তাদের মধ্যে সিংহভাগই ছিল দরিদ্র এবং নবাবী আমলের মৃত প্রচ্ছায়াকে আঁকড়ে থাকা। তাই তাদের জীবনযাপনে ঐ দুই নবাবী ভাষা এবং বাংলার মিশ্রিত রূপ প্রচলিত ছিল এমনটা ভাবা যেতেই পারে। বটতলা এদেরও নিজের পাঠকবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং প্রকাশনায় হিন্দু–মুসলিম ঐক্যের ছবি তুলে ধরা তাঁদের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। হিন্দু প্রকাশকরা যেসব ইসলামি বাংলা বই ছাপাতেন তেমনই মুসলিম প্রকাশকরা নতুন বই ও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত পুরানো কাব্য ছাপাতেন। রামলাল শীল ছাপিয়েছিলেন সচিত্র 'গোলেবকাওলি', 'হাতেমতাই' ও 'ইউসুফ জোলেখা'। অনেক ইসলামি ধর্মগ্রন্থও প্রকাশিত হত এবং নদীবক্ষে মুসলিম মাঝিমাল্লারা একসঙ্গে বসে সেই পাঠ শুনতেন এমনটাই জানাচ্ছে Calcutta Review এরপ্রতিবেদন।[৭]

আবার বটতলার যে লোকশিক্ষামূলক উদ্যোগ সেখানেও হিন্দু–মুসলিম বেড়াজাল ভাঙা হত শিক্ষার স্বার্থে। চিঠি লেখার নিয়ম শেখাতে গিয়ে একটি চটি বইয়ের উদাহরণ দেন অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্ত–

গাঁয়ের জমিদার যদি হয় মুসলমান
বন্দের সেলাম বলে লিখিবে তখন।[৮]

এই দৃষ্টান্তের ঠিক উলটোদিকে ইসলামি লেখকদের বইতে উঠে আসছে আরেক

সম্প্রদায়ের বেড়া ভাঙার চেষ্টা। মুসলিম প্রকাশক কাজী সাহা ভিক হিন্দুদের বোঝার সুবিধের জন্য পণ্ডিত দিয়ে মুসলিম বাংলাকে 'বাংলা পদ্য ছন্দে সাধুভাষায় রচনা' করাচ্ছেন নতুনভাবে। আবার মোহাম্মদ দানেস এর 'চাহার দরবেশ' এর বাংলা অনুবাদ বিষয়ে লিখছেন–

চলিত বাঙ্গালায় কেচ্ছা করিনু তৈয়ার।
সকলে বুঝিবে ভাই কারণে ইহার।।[৯]

আলাদা শব্দচয়নে একই কথা লিখছেন 'বদিউজ্জমাল' কাব্যের অনুবাদকারী এবং 'গোল হরমুজ' কাব্যের কবি। সম্প্রদায়গত বিভেদ সরিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বইয়ের পাঠককে আপন করাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

বটতলার বই এর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে আলোচনার বিষয় হতে পারে। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে লেখা বটতলার বইগুলির অনেকক্ষেত্রেই মাধ্যম পদ্য, এবং সেটা পয়ার বা ত্রিপদীতে। পণ্ডিত বা সাধারণ নির্বিশেষে সবাই যাতে তার স্বাদ নিতে পারে। গদ্য হলে সেখানে প্রাধান্য পেত মুখের ভাষা, এমনকি আঞ্চলিক ভাষা পর্যন্ত। আলাদা আলাদা অঞ্চলের মানুষদের জন্য পসরা সাজিয়েছিল বটতলা। হুগলি নদীর তীরে সাহেবদের কলকেতা শহরের কলকাত্তাইয়া বুলি, যার কথা স্বামী বিবেকানন্দও লিখেছেন তাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না বটতলা। সভ্যতার গর্বের আধিপত্যবাদ নয় বরং প্রকৃত জনসভার সাহিত্য হয়ে ওঠার দাবি ছিল তার। পাঠকরা যেহেতু সমাজের নিচের তলা থেকেই অধিকাংশ এসেছিল তাই সাধু ব্যাকরণ এর ধার ধারতেন না তাঁরা। চলিত ভাষা আর প্রবচন হুবহু মুদ্রিত হত। বানান হত উচ্চারণ অনুযায়ী, সেভাবে গুরুত্ব পেত না ণ–ত্ব ও ষ–ত্ব বিধি। মৌখিক ভাষাকে সর্বার্থে লেখার ভাষা করে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁরা–

ফেরেবি মামলা পেস নাহক করিল।
তাহার ছরবে মর্দ্দ পেরেসান ছিল ।।

...

এখন করহ দোওআ জত দিনরাত।
দুস্মন জাহানে জেয়ছা না তাকে তাহার।।

প্রাচীনতম মুসলিম প্রকাশক কাজি সফীউদ্দিনের প্রকাশিত 'নবীবংশ'–এর অনুবাদ 'কাছাছোল আম্বিয়া'– এর (১৮৬১)–র অংশ এটি। 'পেরেসান' শব্দের ব্যবহার এবং 'দোওআ', 'জত', 'দুস্মন' এই তিনটি বানান লক্ষণীয়। এটা একটা উদাহরণ এমন অসংখ্য পাওয়া যাবে বটতলার অন্যান্য বইগুলিতে। 'শব্দকল্পলতিকা' নামে একটি

বইতে প্রয়োজন বানানটি 'পয়জন' লেখা হয়েছে, অর্থা উচ্চারণের মাধ্যমে মানেটুকু বোঝানোই তাঁদের কাছে ছিল মুখ্য, বানানশুদ্ধি অতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমাদের উদ্দেশ্য হল বটতলার উত্থানের পিছনে আঞ্চলিক প্রেক্ষিতটিকে দেখানো। বাংলার গ্রামের একটা বিরাট অংশ কিন্তু তখনো শ্রুতিনির্ভর সংস্কৃতি থেকে বেরোতে পারেনি। পুথি এবং ছাপা বই দুটোই এত দুর্লভ যে Oral tradition ই ছিল একমাত্র পথ, সে প্রাথমিক শিক্ষাই হোক বা বিনোদন। বটতলার পথচলা শুরু সেই পথ ধরেই। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে তাই তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল এত বেশি।

।৬।

যেকোন সাহিত্য সংরূপেই আঞ্চলিকপ্রভাব থাকা সঙ্গত। সাহিত্য যেমন তার পরিপার্শ্বের বৈশিষ্ট্যকে নিজের শরীরে ধরে রাখে তেমনই আঞ্চলিক বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত একটি সাহিত্য বা সাহিত্যধারাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সেখানে সক্রিয় হয় সমাজ–রাজনীতি–অর্থনীতি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠকের চাহিদা। বটতলা নিছক কিছু ছাপাখানা নয়, বরং বাংলার মুদ্রণসংস্কৃতির একটা সমান্তরাল ধারা। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় আলোকিত বাঙালি যখন ছাপা বইয়ের পাতায় চোখ রাখছে তখন সমাজের নিচের তলার লোকেদের জন্য space তৈরি করছে বটতলা। তথাকথিত অশ্লীলতার ধারণাকে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে কলকাতার সমাজজীবন থেকে ছেঁকে তোলা ঘটনা নিয়ে প্রহসন বা মশলাদার কাহিনি লিখছে। গৌরবের বিষয় বটতলা শুধু সেখানেই না থেমে রকমারি বিষয়কে নিজের আওতায় নিয়ে এসেছিল। মাল বা জমি বিষয়ক আইনের বই আর সুখী দাম্পত্যজীবন কাটানোর উপায় বাতলানো পুস্তিকা একই ঝুড়িতে নিয়ে ফেরিওয়ালারা যেত গ্রামে গ্রামে। কলকাতায় বটতলার সম্ভাব্য সূচনাকাল ১৮১৭ যে বছর পাশ্চাত্য শিক্ষার তীর্থক্ষেত্রটি নির্মিত হচ্ছে, নাম তার হিন্দু কালেজ। সেখানে পাঠের অধিকার ছিল সম্ভ্রান্ত ধনী হিন্দুসন্তানদের। তিনটি বৈশিষ্ট্যের একটিরও অভাব থাকলে হিন্দু কালেজের দ্বার খুলবে না তার কাছে। জনশিক্ষা কমিটির সেক্রেটারি মেকলে তাঁর মিনিটে স্পষ্ট লিখেছিলেন 'Higher class of natives at the seats of Government'[৮] অর্থাৎ জনশিক্ষা আর যাই হোক জনসাধারণের জন্য ছিল না। ঠিক একারণেই তথাকথিত অশ্লীলতারপ্রচারক বটতলার বইকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছিল সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চমার্গের বাঙালি। বটতলার রসালো, চটকদার কাহিনিকে তাঁরা যেমন অস্বীকার করলেন তেমনই পদে পদে তাচ্ছিল্য করলেন এর শিক্ষামূলক দিকগুলিকে। সমকালীন কলকাতার রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলিতে বটতলায় ছাপা সস্তার রামায়ণ–মহাভারতকে নিয়মিত সমালোচনায় বিদ্ধ করা হত। অবশ্য সংস্কৃতিজগতে

মূলধারার কর্তাব্যক্তিরা পাশাপাশি উঠে আসা সমান্তরাল সংস্কৃতি বা Other এর স্বরকে কখনোই স্বীকৃতি দেননি।

বটতলা অবশ্য তাতে নিষ্প্রদীপ হয়ে যায়নি। ১৮১৭ এ বিশ্বনাথ দেব যে ছাপাখানা বানালেন তা কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার গ্রামে গ্রামে জনশিক্ষার প্রাথমিক চেষ্টাটুকু শুরু করেছিল। শহর কলকাতার আঞ্চলিক পটভূমি থেকে যে প্রকাশনার জন্ম হল অচিরেই তা নিজের পরিধি এতটাই বিস্তৃত করেছিল যে আজ দুশো বছর পরেও প্রথম সার্থক বাংলা জনশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর শিরোপার জন্য জোরালো দাবি জানাতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। *Calcutta Review*, January 1845 vol. 12.22.(1845), P. 198. শ্রীপান্থ (নিখিল সরকার) তাঁর *কলকাতা* বইটির 'ব্ল্যাক টাউন ও ব্ল্যাক জমিদার' রচনায় এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন।

২। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সোনাগাজি ও বটতলাঃ দুই যমজের কাহিনী'। অন্তর্গত সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান* (কলকাতাঃ অনুষ্টুপ, ২০১৩) পৃ ৩২৫।

৩। জয়ন্ত কুমার গোস্বামী, *সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন* (কলকাতাঃ সাহিত্যশ্রী, ১৯৬০)।

৪। সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি* (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪) পৃ ৯৪।

৫। বিনয় ঘোষ, 'বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণি', অন্তর্গত বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* (কলকাতা ঃ প্রকাশ ভবন, ১৯৬৮) পৃ ১৯০।

৬। শ্রীপান্থ, 'কলিযুগে কলকাতায় কবির বাজার', অন্তর্গত শ্রীপান্থ, *বটতলা* (কলকাতা ঃ আনন্দ পারলিশার্স, ১৯৯৭) পৃ ১৩।

৭। *Calcutta Review*, vol. 13.26 (1850): pp. 257-283.

৮। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের বাংলায় লোকশিক্ষা ও বটতলা সাহিত্য', মূলগ্রন্থ *বাঙালির বটতলা*, অনুষ্টুপ, ২০২১, পৃ ২০।

৯। শ্রীপান্থ, 'কলিযুগে কলকাতায় কবির বাজার' , পৃ ৩২।

১০। *Macauley's Minute*, 1835.